আমাদের সময়

তারিখ ... 02 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

ড. মো. শরিফ উদ্দিন

সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা

জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিটি দাঁড়ায় প্রাথমিক স্তর থেকেই। মৌলিক ভিত্তি মজবুত ও দৃঢ় না হলে পরবর্তী ফল নেতিবাচক হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।

শিক্ষা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা এবং অধিকার। সব সরকারেরই শিক্ষার উন্নয়নে নানা কর্মসূচি রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, বিয়োজনে রয়েছে আন্তরিক কর্মকাণ্ডও। নানা সময়ে সমসাময়িক প্রেক্ষাপট, সমকালীন বাস্তবতা, উন্নত বিশ্বের সঙ্গে পর্যালোচনার জন্য শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও অব্যাহত রয়েছে। প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি। এরপরও চলছে নানা গবেষণা ও নতুন নতুন পদ্ধতি সংযোজন। এরই ধারাবাহিকতায় কিছুদিন পরপরই শিক্ষাব্যবস্থায় সংযোজিত হয় নতুন নতুন কর্মপদ্ধতি। তবে সংযোজিত ও পরিবর্তিত পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার সামঞ্জস্যতা, অবকাঠামোগত পরিস্থিতি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর যথার্থতা উপেক্ষিতই রয়ে গেছে বরাবরই। নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের আগে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। এ কারণে পদ্ধতির উপযোগিতা ও সুফল বের করে আনা কঠিন হয়। অনেক ক্ষেত্রেই অধরাই রয়ে যায় এ পরিবর্তনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সৃজনশীল পদ্ধতি সংযোজন শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, মননশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধির জন্য এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধার দুরন্ত বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এ পদ্ধতি বলেই দাবি করা হয়। চিন্তাশক্তির মাধ্যমে শিশুদের ভাবনার জগৎ আরও বিস্তৃত হবে। উন্মুক্ত হবে চিন্তার পরিধি। কিন্তু লক্ষ্যের সঙ্গে বাস্তবতার বিরাট ফারাক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিবর্তনের মাধ্যমে অতিদ্রুত ফল লাভের প্রত্যাশা পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। ইতিবাচকতার চেয়ে নেতিবাচকতাই আলোচিত হচ্ছে বেশি।

সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থায় দেশে বেড়েছে পাসের হার। এখন বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই কৃতকার্য হয়। অকৃতকার্য শব্দটি প্রায় হারাতেই বসেছে। কিন্তু শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সৃষ্টি হচ্ছে বিতর্ক। প্রকৃত শিক্ষার মান বেড়েছে কি না, তা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। পরিবর্তিত পদ্ধতিতে মেধাক্রমের ধারা বিলুপ্ত হয়েছে। এখন কেবল বেশি জিপিএর প্রবণতা। জিপিএ ৫-এর একটি মারাত্মক প্রবণতা তৈরি হয়েছে শিক্ষার্থীদের মাঝে। বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায়। সামাজিক অবস্থানের কারণে কচি শিশুদের ওপর রয়েছে অভিভাবকদের চাপ। শিশুকে স্কুলে পাঠিয়ে গেটের বাইরে অপেক্ষারত মায়েদের আড্ডা, অফিসে কলিগদের আলাপ, চায়ের আসর কিংবা সামাজিক কোনো ফোরামে নিজের সন্তানের ফল নিয়ে আলোচনা হয়। গর্ব সহকারে সন্তানের জিপিএ ৫ পাওয়ার গল্পটা বলতে পারাটা অনেকটা গৌরবের। অনেকটাই সামাজিক আভিজাত্যের বিষয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাতেই জিপিএ ৫ পাওয়ার জন্য শিশুর যে শারীরিক পরিশ্রম, মানসিক চাপ, পরীক্ষা ও ফলের আতঙ্ক– তা একবারও অভিভাবকদের ভাবিয়ে তোলে কি না প্রশ্ন রয়ে যায়। শিশুর বিকাশ, মানসিক দক্ষতার পরিস্ফুটন বা স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির বিষয়টি অভিভাবকদের ভাবনা থেকে পরিপূর্ণ উপেক্ষিত রয়ে যায়।

এ ব্যবস্থায় শিক্ষার মান গৌণ হয়ে গেছে। শিশু প্রকৃতই কিছু শিখছে কি না– চিন্তাটি নেই শিক্ষকদের মাথাতেও। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ঝুঁকছে জিপিএ ৫ বৃদ্ধির প্রতি। অভিভাবকদের প্রত্যাশা, সমসাময়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখা কিংবা গতবারের চেয়ে ভালো ফল লাভের দুর্দান্ত অভিপ্রায় জিপিএ ৫ পাওয়ার প্রতি সংশ্লিষ্টদের বেপরোয়া করে তুলেছে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষকরা অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত হয় না। এখান থেকেই শুরু শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়া। অভিভাবকদের বক্তব্য, যে কোনো মূল্যে নিজের সন্তানের জিপিএ ৫ নিশ্চিত করা। শিক্ষকরাও আরও এক ধাপ এগিয়ে। এ ধারা থেকেই পরীক্ষা কেন্দ্রে অনৈতিকপন্থা অবলম্বনের হিড়িক পড়ে গেছে। বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে এসব প্রকাশিতও হয়েছে।

সম্প্রতি এ চিত্র ফুটে উঠেছে গণসাক্ষরতা অভিযানের একটি রিপোর্টে। 'প্রাথমিক শিক্ষা কোন পথে'– এ বিষয়ে সংস্থাটি 'এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০১৪'-এ বেশকিছু তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছে। এটি এক কথায় ভয়াবহ, আতঙ্ক ও আশঙ্কার।

গণসাক্ষরতা অভিযানের এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের নানা চিত্র। এতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ঘিরে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি ও সৃজনপ্রীতি বাসা বেঁধেছে। এ পরীক্ষাকে ঘিরে প্রাইভেট পড়ানো ও কোচিং-বাণিজ্যের মহোৎসব চলছে সারা দেশে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধেক শিক্ষকই এ-সংক্রান্ত কোচিং-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া এ নিয়ে আরও ১৩ ধরনের অনিয়মের কথাও উল্লেখ করা হয়। সর্বোচ্চ ফল অর্জনের প্রবণতায় পরীক্ষায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করে। এতে সহযোগী হন শিক্ষকরাও। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিভাবকরাও। অনৈতিক পন্থা অবলম্বনের এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার হলে শিক্ষকরা ব্ল্যাকবোর্ডে প্রশ্নের উত্তর লিখেও দেন। পরীক্ষার শেষ সময়ে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের দেখাদেখি করে উত্তর মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়। পরীক্ষকদের উদারভাবে খাতা মূল্যায়ন, অর্থের বিনিময়ে উত্তরপত্রের গোপন কোড নম্বর ফাঁস করে দেওয়া, শিক্ষক নন এমন লোক দিয়ে পরীক্ষা হল পরিদর্শন, গাইড ও সাজেসন্সের নামে একশ্রেণির শিক্ষকের প্রশ্ন ফাঁস ও বিতরণ, পাসের হার বাড়ানোর নামে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনাও ঘটে। জীবনের শুরুতেই কোমলমতি একজন শিক্ষার্থীকে অনৈতিক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ফেলা হচ্ছে। এতে তাদের স্পর্শকাতর মনোজগৎ যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

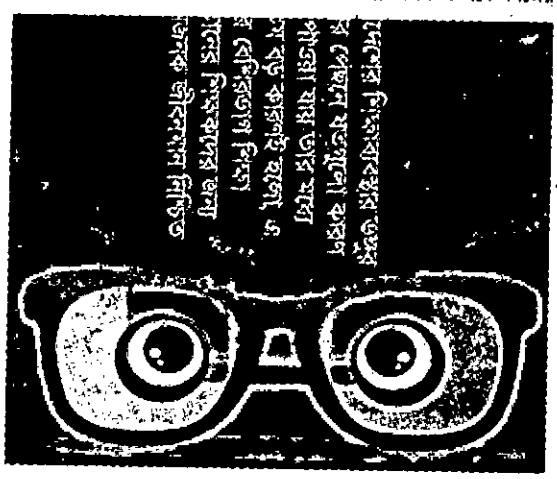

অজান্তেই নেতিবাচক ধারণার তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতের নাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব যেসব শিক্ষকের, তারাও অনৈতিকতার চর্চা করছেন। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কাজ করছেন তারা।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক সমাপনীকে ঘিরে চলছে রমরমা কোচিং-বাণিজ্য। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এখন পুরোপুরি কোচিংনির্ভর হয়ে পড়েছে। পরীক্ষার্থীদের তৈরি করার জন্য মূল বই বাদ দিয়ে দলবদ্ধ কোচিং ও মডেল টেস্ট বিদ্যালয়গুলোর প্রধান কর্মকাণ্ডে পরিণত করেছে। এর সঙ্গে উপজেলা শিক্ষা অফিসও যুক্ত। ৮৬ শতাংশের বেশি বিদ্যালয় সাধারণ ক্লাস কার্যক্রম বাদ দিয়ে কোচিং করাচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এদের মধ্যে ৭৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে কোচিং বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক কোচিংয়ের হার শহরের চেয়ে গ্রামের বিদ্যালয়ে বেশি।

বিষয়গুলো কেবল আতঙ্কেরই নয়, মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রধান অন্তরায়। এ ধারা অব্যাহত থাকলে কয়েক বছর পরে প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে। সম্প্রতি গত কয়েক বছরে এইচএসসি পরীক্ষায় অভূতপূর্ব জিপিএ ৫ পাওয়ার রেকর্ড হয়। কিন্তু মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পাস নম্বর উঠাতেই ব্যর্থ হয় জিপিএ ৫ পাওয়া সেই শিক্ষার্থীদের বিরাট একটি অংশ। প্রাথমিক অবস্থাতেই যদি জিপিএ ৫ পাওয়ার দুরন্ত প্রতিযোগিতা তৈরি হয়, মেধাচর্চা ও বিকাশ এবং শেখার আগ্রহের বিপরীতে; তবে এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও শঙ্কা তৈরি হয়। কেবল জিপিএ ৫-এর সনদ প্রদান নিয়ে শিক্ষার্থীদের মেধাচর্চার ভয়াবহ ক্ষতিসাধিত হচ্ছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভালো করে পড়াশোনার চেয়ে অনৈতিক পন্থা উপায় শেখানো হচ্ছে। সৃজনশীলতা শিক্ষার জন্য সহায়ক হতে পারে– কিন্তু শিক্ষকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও যথাযথ জ্ঞান অর্জন ছাড়াই শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ওপর পদ্ধতিটি চাপিয়ে দেওয়া কতটা যৌক্তিক তা ভেবে দেখা জরুরি। দেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি শিক্ষকের এ সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণ নেই। শিক্ষার্থীদেরও ধারণার অভাব। রয়েছে মানসম্মত শিক্ষকের প্রয়োজনীতাও। অবকাঠামোগত উন্নয়নও দরকার। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ উন্নত করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মান বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তরে মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব আছে। এই অভাব দূর করতে হবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকতায় মেধাবীদের আগ্রহী করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার মান বাড়ানো যাবে না। মানুষের জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে সাহায্য করে শিক্ষা। কিন্তু জীবনের শুরুতেই শিক্ষাক্ষেত্রে যাদের অসদুপায় অবলম্বনের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হচ্ছে। পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য শিক্ষার্থীদের অনৈতিকতার দিকে ঠেলে দেওয়া অপরাধ। শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে বিবেচনা করাও অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মেধাবী ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব কোনোভাবেই অবহেলার নয়। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে ভাবতে হবে। নতুন পদ্ধতির নামে শিক্ষার্থীদের মেধার জগৎ নষ্ট করার দায় এড়ানো কঠিন। সহজবোধ্য সিলেবাস প্রণয়নসহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সৃজনশীল পদ্ধতির বইপত্র সহজলভ্য করা অতীব জরুরি। বাস্তব প্রেক্ষিতে প্রাথমিক ব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতিকে যুগোপযোগী ও মানসম্মত করতে রাষ্ট্রকেই জরুরি পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

দুই.

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভঙ্গুর অবস্থার পেছনে যতগুলো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম বড় কারণই হলো, এ দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য সম্মানজনক জীবনমান নিশ্চিত করা যায়নি। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের অবস্থা সবচেয়ে বেশি করুণ এবং নির্মম। শিক্ষকরা যে সমাজে বসবাস করেন সেই সামাজিক মানদণ্ডে তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক অবস্থান অনেক নিচে থাকে, তাদের যে বেতন কাঠামো সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তা শুধু স্বল্পই নয়, ঠিকভাবে বেঁচে থাকার পক্ষেও সহায়ক নয়। তারা সমাজস্থ শিশুদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়তে নিজেদের আস্ত জীবনটাকেই উৎসর্গ করছেন অথচ কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের নিজ সন্তান কিংবা উত্তরাধিকারদের ভাগ্যেই উচ্চশিক্ষা জুটছে না, এর পেছনে তো অর্থনৈতিক কারণই মুখ্য। রিসার্চ ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশনের টিম যখন গবেষণার জন্য সারা দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ঘুরেছে, আমরা দেখেছি, মৌখিকভাবে শিক্ষকদের জীবননান, সামাজিক মর্যাদা বিষয়ে আমরা যা বলি, আসলে বাস্তবিক অবস্থা আরও বেশি ভয়াবহ। এটি সম্ভবত বাংলাদেশেই সম্ভব যে, দুদিন পরপর দু'পয়সা বেতন-ভাতার দাবিতে শিক্ষকদের রাজপথে নামতে হয়, এরপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের চোখ রাঙানি দেখতে হয়, পুলিশের লাঠিপেটার শিকার হতে হয়, জলকামান এবং নিষিদ্ধ স্প্রের কবলে পড়ে জীবনও দিতে হয় পড়ন্ত বেলায়। গ্রামগঞ্জের লৌকিক সমাজে শিক্ষকতা পেশাকে সম্মানজনক হিসেবে বিবেচনা করা হলেও শুধু এই সম্মান দিয়ে একটা সমগ্র জীবনকে টেনে নেওয়া দায়, কারণ একজন শিক্ষককেও সংসার গঠন করতে হয়, পরিবার-পরিজন কিংবা স্বজনদের প্রতি তারও কর্তব্য থাকে, যেগুলো তাকে অবশ্যই পালন করতে হয়। আগের দিনে যেমন মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আসার জন্য আগ্রহ দেখাতেন, নানা কারণেই শিক্ষকতায় সেই প্রবণতা এখন ক্রমহ্রাসমান। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো খুঁড়িয়ে চললেও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলোর দশা বেশি করুণ, ন্যূনতম নিশ্চয়তা না থাকায় শিক্ষক হিসেবে এখন মেধাবীরা সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন, এতে সবচেয়ে ক্ষতি এবং ঝুঁকির মুখে পড়ছে আমাদের আগামী প্রজন্ম, আগামীর বাংলাদেশ। এই সম্মুখ সাক্ষাৎ দুর্বিপাক থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন আশু পদক্ষেপ। সরকারকে অবশ্যই শিক্ষা খাতে মূল বাজেট বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জীবনমানের সার্বিক উন্নয়নে বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রণোদনা বাড়াতে হবে এবং ধারাবাহিকতাও অব্যাহত রাখতে হবে।

লেখক : শিক্ষাবিদ, প্রেসিডেন্ট, রিসার্চ ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশন
msharifju@yahoo.com